

Junior Champion

M A G A Z I N E

Vol. 6

October 2026



Artwork: Ngo Hoang Anh Linh, *Our Family in the Storm*

Children and Youths Stories from Vietnam



Artwork: Pham Diem Quynh, *A Volunteer's Memory of the Flood*

এডিএন জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন ম্যাগাজিন, ভলিউম ৬
ভিয়েতনামের শিশু ও তরুণদের গল্প

প্রকাশিত: ১৩ অক্টোবর ২০২৬

ISSN ২৭৫৯-০৩৮০

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবস উপলক্ষে এই সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়েছে। এই দিবসটি প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর, (ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন) জাতিসংঘ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যালয় (UNDRR) দ্বারা পালিত হয়।

ভলিউম সম্পাদক: অর্কনীল ঘোষ এবং অনুষ্কা কোনার

অতিথি সম্পাদক: ড. ট্রান, টো ডিয়েম হ্যাং (ফ্লোরা)

উপদেষ্টা বোর্ড: অধ্যাপক নিবেদিতা রায়-বেনেট এবং ড. হিদেয়ুকি শিরোশিতা

ছবির কৃতিত্ব

প্রচ্ছদ (ফ্রন্ট কভার): © গু হোয়াং আন লিন এবং ©ফাম ডিয়েম কুইন

পিছনের প্রচ্ছদ (পিছনের কভার): © লে ডাং কোয়াং এবং © গোক ডুয়াং

প্রবন্ধ ১ (পৃ. ৮): © ট্রান হা মাই

প্রবন্ধ ৫ (পৃ. ১৪): © হুইন মিন থু

অ্যাভয়েডেবল ডেথস নেটওয়ার্ক (এডিএন/ADN) পরিচিতি:

অ্যাভয়েডেবল ডেথস নেটওয়ার্ক (এডিএন/ADN) হলো বিভিন্ন ধরনের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত, বৈচিত্রময়, গতিশীল, সবার জন্য উন্মুক্ত এবং নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করা একটি বৈশ্বিক ও স্থানীয় নেটওয়ার্ক, যেখানে বিশেষজ্ঞ, অনুশীলনকারী এবং গবেষকরা একসাথে কাজ করেন। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট প্রযুক্তিগত দুর্যোগ এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট মানব মৃত্যু ও আহত হওয়া প্রতিরোধ করা। নীতিনির্ধারক, গবেষক, অনুশীলনকারী এবং নাগরিকদের জীবন বাঁচাতে এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করাই ADN-এর অস্তিত্ব। আমাদের উদ্দেশ্য, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেভাই ফ্রেমওয়ার্কের প্রথম দুটি বৈশ্বিক লক্ষ্যের সাথে সরাসরি যুক্ত, এবং আমরা সেভাই ফ্রেমওয়ার্ক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিশ্রুতি প্ল্যাটফর্মে সদস্য।

১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে, এডিএন(ADN) একটি বৈশ্বিক জনসচেতনতা প্রচারণা, অ্যাভয়েডেবল ডেথের জন্য আন্তর্জাতিক সচেতনতা দিবস (IAD4AD) চালু করে। IAD4AD-এ যোগ দিতে বা সমর্থন করতে, অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন: <https://iad4ad.avoidable-deaths.net/>

এডিএন (ADN) পাবলিকেশন, অ্যাভয়েডেবল ডেথস নেটওয়ার্ক (ADN) দ্বারা প্রকাশিত:

অফিস: কানসাই বিশ্ববিদ্যালয়, তাকাতসুকি, জাপান; লিসেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, লিসেস্টার, যুক্তরাজ্য

ওয়েবসাইট: avoidable-deaths.net

যোগাযোগ: contact@avoidable-deaths.net

© ২০২৬ অ্যাভয়েডেবল ডেথস নেটওয়ার্ক। সমস্ত শিল্পকর্ম স্বতন্ত্র শিল্পীদের কপিরাইট হিসেবে সংরক্ষিত।

সূচিপত্র

সভাপতিদের বার্তা.....	১
অতিথি সম্পাদকের বার্তা.. ..	৩
সম্পাদকদের বার্তা	৫
ঐতিহাসিক ঝড়	৭
ঝড়-বন্যার মাঝে এক প্রদীপ, আর সহনশীলতার শিক্ষা	৯
উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার	১০
হতাশা থেকে আশার পথে	১২
ঝড়ের মাঝেও মানবতা	১৩
ঝড়ের পর শুরু হলো নতুন লড়াই	১৫
যখন লালচে পানি সব ভাসিয়ে নিল: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা	১৬
ঝড় পরবর্তী পুনরুত্থান	১৭
একটা নৌকা!	১৯
২০২০ সালের মধ্য ভিয়েতনামের বন্যা: সৈনিকদের আত্মত্যাগ	২১
বিদ্যুৎহীন রাতগুলো	২৩

সভাপতিদের বার্তা

এডিএন (ADN) জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন ম্যাগাজিন মাস্টার অর্কনীল ঘোষ এবং মিস আনুশকা কোনারের নেতৃত্বে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। আমাদের সম্পাদকেরা তাদের সৃজনশীলতা, নিষ্ঠা ও সাহস দিয়ে শিশু-তরুণদের অনুপ্রাণিত করছে এবং পরিবর্তনের প্রতিনিধি হয়ে উঠছে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ২০২৬ সালের ১৩ অক্টোবর, ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (UNDRR) এর সাথে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবস উপলক্ষে আমরা ৬ষ্ঠ খণ্ডটি প্রকাশ করতে যাচ্ছি।

২০২৩ সালে ফিউচার লিডারস স্কিমের অধীনে সর্বপ্রথম প্রকাশিত এডিএন(ADN) জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন ম্যাগাজিন শিশু ও তরুণদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া এবং দুর্যোগের প্রভাবের অভিজ্ঞতার গল্প তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দাড়িয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে সময়োপযোগী একটি থিম নিয়ে কাজ করা হয়, যেখানে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞরা নির্দেশনা দেন। এই খণ্ডের জন্য আমরা ইউনিভার্সিটি অফ লিসেস্টার ড. হ্যাং (ফ্লোরা) ট্রান-এর সাথে কাজ করতে পেরে গর্বিত।

এই খণ্ডটি সরাসরি ইউ এন ডি আর আর (UNDRR) এর এবারের বিষয়বস্তু "রেসিলিয়েন্স স্টার্টস এট হোম" (Resilience Starts at Home) বা "ঘর থেকেই শুরু হোক সহনশীলতা" এর সাথে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে। শিশু ও তরুণদের কাছে তাদের বসত বাড়ি তাদের সবকিছু। বসত বাড়ি ই তাদের পৃথিবী। এটা তাদের নিরাপদ আশ্রয়, যেখানে তারা স্মৃতি তৈরি করে এবং বড় স্বপ্ন লালন করে। কিন্তু অনেক শিশুর জন্য এই বাস্তবতা সত্য নয়, বিশেষ করে তারা যারা বারবার জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করে।

ভিয়েতনামে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে টাইফুন ইয়াগি এবং ২০২৬ সালের জুলাই মাসে টাইফুন মায়সাক ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যা নিয়ে আসে কুয়াং নিন্ অঞ্চলে, যা কুয়াং ইয়েনের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই টাইফুন ও বন্যা দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটায় এবং ঘরবাড়ি, স্কুল, কৃষিজমি ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি করে।

এই ম্যাগাজিনে ১১ জন তরুণ লেখকের অত্যন্ত ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতির গল্প তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের পড়াশোনায় বিঘ্ন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সহ আরও নানা প্রতিবন্ধকতা। এই গল্পগুলো

পড়লে চোখে জল না এসে উপায় নেই। তবে, এই গল্পগুলো শিশু ও তরুণদের চোখ দিয়ে দুর্যোগের প্রভাব বোঝার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা সহনীয় করার পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ করে দেয়।

ড. ট্রান এই দুঃখদায়ক ঘটনা গুলোকে কুয়াং নিন্ অঞ্চলের শিশুদের সহযোগিতায় সংরক্ষণ করার একটি সুযোগে রূপান্তরিত করেছেন। এমনকি সবচেয়ে অন্ধকার সময়েও, আমাদের সন্তানদের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যতের আশা ধরে রাখতে হবে। হিদেয়ুকি এবং আমি, দুজনই এই বিষয়ে গভীর দায়িত্ববোধ অনুভব করি, বিশেষ করে দুই ফুটফুটে কন্যা সন্তানের বাবা-মা হিসেবে। লেখকদের একজন এই অনুভূতিটিকে খুব সুন্দরভাবে শব্দে ফুটিয়ে তুলেছেন: "আমাদের চারপাশের ধ্বংসস্তূপ থেকেই জীবন নতুন করে জন্ম নিচ্ছিল।"

আমাদের অতিথি সম্পাদক ড. ট্রান-কে আন্তরিক ধন্যবাদ, যিনি ভিয়েতনাম থেকে এই গল্পগুলো সংগ্রহ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমরা আশা করি আপনারা লেখাগুলো পড়ে উপভোগ করবেন এবং এই পৃষ্ঠাগুলো থেকে ততটাই অনুপ্রেরণা, সাহস ও আশা খুঁজে পাবেন, যতটা আমরা আপনাদের কাছে এগুলো পৌঁছে দিতে গিয়ে পেয়েছি।

প্রফেসর নিবেদিতা রায়-বেনেট এবং ড. হিদেয়ুকি শিরোশিতা*

অতিথি সম্পাদকের বার্তা

ভিয়েতনামের উত্তর-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত কুয়াং ইয়েন একটি নিচু ডেল্টা অঞ্চলের শহর, যেখানে বাখ ডাং নদী এসে সাগরে মিশেছে। এখানকার প্রকৃতি জোয়ারের চর, ম্যানগ্রোভ বন আর চিংড়ি-ঝিনুকের ঘের দিয়ে তৈরি। এখানকার মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম জোয়ার-ভাটার উপর ভরসা করেই বেঁচে আছে, চিংড়ি ও ঝিনুক চাষ করে, মোহনায় মাছ ধরে, আর সেই ম্যানগ্রোভ বনের যত্ন নিয়ে, যে বনগুলোই নীরবে তাদের উপকূলকে সাগরের সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ থেকে রক্ষা করে।

এই ভূগোলই একদিকে কুয়াং ইয়েনকে বাঁচিয়ে রাখে, আবার অন্যদিকে ঝুঁকিতেও ফেলে। শহরটি সরাসরি পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় টাইফুন চলাচলের পথে পড়েছে। ফলে এখানে প্রায়ই গ্রীষ্মকালী় ঝড় ও ভারী বর্ষার বৃষ্টি হয়, যা নদী ও জোয়ারের পানি বাঁধ উপচে মাঠ, ঘের ও ঘরবাড়ি ডুবিয়ে দেয়। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে টাইফুন ইয়াগি, কয়েক দশকের মধ্যে ভিয়েতনামে সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়, কুয়াং নিন অঞ্চলে ভয়াবহ আঘাত আনে, আর এর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সহ্য করতে হয় কুয়াং ইয়েনের উপকূলীয় মানুষদের। এর দুই বছরেরও কম সময় পর, ২০২৬ সালের জুলাইয়ে টাইফুন মায়সাক আবার একই উপকূলে ভারী বৃষ্টি ও বন্যা নিয়ে আসে। এটি মনে করিয়ে দেয় যে, কুয়াং ইয়েনের মানুষের জন্য দুর্যোগ কোনো দূরের সম্ভাবনা নয়, বরং জীবনের এক নিয়মিত অংশ।

এই ঝুঁকির পাশাপাশি, ভিয়েতনামের অন্যান্য গ্রামীণ উপকূলীয় শহরের মতো কুয়াং ইয়েনেরও কিছু ঘন ঘন চাপের সম্মুখীন হতে হয়। কর্মক্ষম মানুষজন বড় শহরের দিকে চলে যাচ্ছে, বয়স্ক মানুষেরা একা একা ঘের আর জমিজমা সামলাচ্ছে, আর স্কুলপড়ুয়া নতুন প্রজন্ম তাদের দাদাদাদি, নানা-নানীদের কষ্ট করে শেখা বেঁচে থাকার জ্ঞানটা আগের মতো সরাসরি আর শিখতে পারছে না। এই সবকিছু মিলে দুর্যোগ মোকাবিলার অভিজ্ঞতা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্বাভাবিকভাবে পৌঁছানোটা আরও কঠিন করে তুলছে। ফলে দুর্যোগের অভিজ্ঞতা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্বাভাবিকভাবে পৌঁছানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে দুর্যোগের প্রস্তুতি নিজে থেকে শেখা হবে বলে ধরে না নিয়ে, বরং সক্রিয়ভাবে শেখানোটা আরও জরুরি হয়ে উঠেছে।

কুয়াং ইয়েনের সাথে আমার নিজের যোগাযোগ শুরু হয়েছিল দুর্যোগ শিক্ষা দিয়ে নয়, বরং সংরক্ষণ নিয়ে কাজ দিয়ে। আমি একজন গবেষক হিসেবে দেখছিলাম, কীভাবে নিম্নকারী প্রযুক্তি দিয়ে ম্যানগ্রোভ ও মোহনার সংরক্ষণ নিয়ে মানুষকে সচেতন করা যায়। সেই কাজের সূত্রেই ইয়েন হাং প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও হাই স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আমার পরিচয় হয়। যা শুরু হয়েছিল প্রকৃতি নিয়ে গল্প বলার একটি মাঠ পর্যায়ের কাজ হিসেবে, তা ধীরে ধীরে আরও বড় কিছু হয়ে ওঠে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমি বারবার একই গল্প শুনতে পেলাম, ঘর ডুবে যাওয়ার গল্প, জলোচ্ছ্বাস জমি হারানোর গল্প, আর প্রতিবছর টাইফুন মৌসুম যে ভয় ও ক্ষতি নিয়ে আসে তার গল্প। এগুলো কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বলা গল্প ছিল না। মানুষ বলছিল কারণ কষ্টটা এখনো তাদের মনে তাজা, তারা একবার নয়, বহুবার এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেছে।

তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাদের জনসাধারণ বা গোষ্ঠীর সাথে কাজ করতে গেলে সংরক্ষণ ও দুর্যোগ সহনশীলতাকে আলাদা করে দেখা যাবে না। আমি যে ম্যানগ্রোভ নিয়ে পড়তে এসেছিলাম, সেটি নিজেই এক ধরনের সুরক্ষা। একটি জীবন্ত দেয়াল যেটি এই পরিবারগুলোকে যারা ঝড়কে ভয় পায়, তার থেকেই তাদের রক্ষা করে। একটি বুঝতে হলে অন্যটিও বুঝতে হয়। ইয়েন হাং স্কুলের শিক্ষক ও কর্মীদের সাথে কাজ করে আমরা ভাবতে শুরু করি, কীভাবে শিক্ষার্থীদের নিজেদের বন্যা ও টাইফুনের অভিজ্ঞতাকে শ্রেণিকক্ষ নিয়ে আসা যায়। কোনো বিমূর্ত তথ্য হিসেবে নয়, বরং জীবন্ত জ্ঞান হিসেবে, যা লিপিবদ্ধ করা, আলোচনা করা এবং সামনে এগিয়ে নেওয়ার মতো।

এই প্রকাশে যা থাকছে, তা সেই প্রচেষ্টারই প্রাথমিক ফল। এখানে কুয়াং ইয়েনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কণ্ঠস্বর আছে, তারা কীভাবে তাদের উপকূলকে বদলে দেওয়া ঝড়গুলোকে বুঝতে চেষ্টা করছে, এবং কীভাবে পরিবেশ রক্ষার সাথে তাদের সমাজের নিরাপত্তার সম্পর্কটা বুঝতে শুরু করেছে। এটি এক অর্থে স্মৃতি, যত্ন ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংযোগের একটি ছোট প্রচেষ্টা যা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তরুণরা, এমন একটি জায়গায় যেখানে পানি বারবার বাড়লেও মানুষ তাদের মাটি ছেড়ে যাবে না।

ড. ট্রান, টো ডিয়েম হ্যাং (ফ্লোরা)

সম্পাদকের বার্তা

প্রিয় পাঠক,

এডিএন জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন ম্যাগাজিনের ষষ্ঠ খণ্ডে আপনাকে স্বাগতম : ভিয়েতনামের শিশু ও তরুণদের গল্প'। এই সংখ্যাটিতে উত্তর ভিয়েতনামে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিশু ও তরুণদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ভাবনার গল্পগুলো একত্রিত করা হয়েছে-যে দুর্যোগ তাদের ঘরবাড়ি, স্কুল, পরিবার ও দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল।

সম্পাদক হিসেবে, নতুন প্রজন্মের এই উদীয়মান কণ্ঠস্বরগুলোকে একটি মঞ্চ দিতে পেরে আমরা গর্বিত। তাদের গল্পগুলোর জন্ম ভয়, অনিশ্চয়তা আর আকস্মিক বিপর্যয়ের মুহূর্ত থেকে; কিন্তু সেই একই গল্পে জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে সাহস, সহানুভূতি, খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং নতুন আশার আলো। এগুলো কেবল বন্যার বিবরণ নয়-নিরাপত্তার অনুভূতি হারানোর কষ্ট, সংকটে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা এবং জল নেমে যাওয়ার পর জীবনকে নতুন করে গুছিয়ে নেওয়ার গল্পের প্রতিফলন।

এই খণ্ডে তরুণ লেখকেরা বর্ণনা করেছে কীভাবে বন্যা তাদের চিরচেনা পরিবেশকে প্রভাবিত করেছিল। নিজেদের ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র, লেখাপড়া, চারপাশ ও পারিবারিক প্রতিদিনের কাজ নিয়ে তাদের ভাবনাগুলো মনে করিয়ে দেয় যে, কীভাবে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহূর্তের মধ্যে চেনা পৃথিবীটাকে বদলে দিতে পারে। একই সাথে, তাদের গল্পে উঠে এসেছে পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত শক্তির গল্প-ভাগ করে নেওয়া প্রস্তুতি, সময়মতো সতর্কতা, নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়া, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং একসাথে ঘুরে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্প।

এই সংখ্যাটি ২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "রেজিলিয়েন্স স্টার্টস অ্যাট হোম" (সহনশীলতার সূচনা ঘর থেকে)-কে প্রতিফলিত করে। একটি দুর্যোগের প্রথম আঘাত প্রায়শই ঘরে এসে পড়ে, কিন্তু দুর্যোগ মোকাবিলার প্রথম প্রস্তুতিও এই ঘর থেকেই শুরু হতে পারে। পরিবারগুলো নিজেদের অঞ্চলের ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করতে পারে, জরুরি রসদ প্রস্তুত রাখতে পারে, নিরাপদ আশ্রয় চিহ্নিত করা, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণ করা এবং শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধীদের মতো সংবেদনশীল সদস্যদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।

লেখকদের গল্পগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সহনশীলতা কেবল বড় অবকাঠামো কিংবা নীতিমালার মাধ্যমে তৈরি হয় না। এটি গড়ে ওঠে প্রতিদিনের জ্ঞান, যোগাযোগ, প্রস্তুতি আর যত্নের মধ্য দিয়ে। এটি তখনই বাড়ে যখন পরিবারগুলো একসাথে পরিকল্পনা করে, প্রতিবেশীরা একে অপরের হাত ধরে, স্কুলগুলো দুর্যোগ মোকাবিলার উপায় শেখায় এবং তরুণদের ঝুঁকির বিষয়গুলো বোঝার ও তা প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

শিশু ও তরুণদের প্রায়ই কেবল দুর্যোগের 'শিকার' হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এই খণ্ডের লেখকেরা প্রমাণ করেছে যে তারা পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তথ্য পৌঁছে দিতে পারে, শিখতে পারে এবং দুর্যোগ মোকাবিলার সক্রিয় অংশীদার হতে পারে। তারা পরিবেশের পরিবর্তন লক্ষ্য করে, সতর্কবার্তা মনে রাখতে, পরিবারের ভয় ও উদ্বেগ বুঝতে পারে এবং কীভাবে নিজেদের ঘর ও সমাজকে আরও নিরাপদ করা যায় তা নিয়ে মূল্যবান ভাবনা ভাগাভাগি করে।

কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে গিয়ে এই গল্পগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দুর্যোগের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। বন্যার ভয়াবহতা কতটা কম বা বেশি হবে, তা নির্ভর করে আমাদের প্রস্তুতি, তথ্যের সহজলভ্যতা, ঘরবাড়ির নিরাপত্তা, আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা এবং বিপদ ধ্বংসস্থাপে রূপ নেওয়ার আগেই সমাজের দ্রুত

পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতার ওপর। ক্ষতিগ্রস্তদের কথা শুনে আমরা বুঝতে পারি কোথায় আমাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা সফল হয়েছে, আর কোথায় ঘাটতি রয়ে গেছে।

এই খণ্ডটিকে অর্থবহ করে তুলতে সার্বিক দিকনির্দেশনার জন্য আমরা অতিথি সম্পাদক ড. হ্যাং (ফ্লোরা) ট্রানের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভিয়েতনামের শিশুদের অভিজ্ঞতাগুলো যত্ন, প্রামাণিকতা ও আন্তরিকতার সাথে তুলে ধরতে তাঁর অবদান ছিল অতুলনীয়।

আপনাকে এই গল্পগুলোর মুখোমুখি হওয়ার ও তরুণ লেখকদের অভিজ্ঞতা নিয়ে গভীরভাবে ভাববার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তাদের এই কথাগুলো পরিবার, স্কুল, সমাজ ও সরকারকে অনুপ্রাণিত করুক—যাতে আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারি যে সহনশীলতা দুর্যোগের পরে নয়, শুরু হয় তার অনেক আগেই: প্রতিটি ঘরে অর্জিত জ্ঞান, সচেতনতা ও সঠিক প্রস্তুতির মাধ্যমে।

অর্কনীল ঘোষ এবং আনুষ্কা কোনার

ঐতিহাসিক ঝড় ত্রান হা মাই

এপ্রিল ২০২৫-এর সময়টা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তখনই আমার এলাকা কোয়াং ইয়েনে এক ভয়াবহ ঝড় আঘাত হেনেছিল। ঝড় আসার কয়েক দিন আগে থেকেই টিভি ও ফোনে টানা আবহাওয়ার সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছিল। বাবা-মা তাড়াহুড়ো করে সব দরজাজানালা শক্ত করে আটকে দিলেন, বাড়ির পাশের গাছের ডালপালা কেটে ছোট করলেন এবং পর্যাপ্ত জল ও বাড়তি খাবার জমিয়ে রাখলেন। এত প্রস্তুতির পরও আমার মন ভীষণ চিন্তিত ছিল, কারণ এত কাছ থেকে এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি আমি আগে কখনো হইনি।

ঝড়ের রাতে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছিল। বাইরের খাঁ খাঁ শব্দে ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল বারবার। টিনের চাল আর জানালায় বৃষ্টির আছড়ে পড়ার শব্দে চারিদিক থমথমে হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে আমরা পুরো পরিবার একটিমাত্র টর্চের আলো ঘিরে বসে রইলাম। বাইরে বিকট শব্দ হলেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠছিল। আমি মনে মনে শুধু একটাই প্রার্থনা করছিলাম-সকালটা যেন তাড়াতাড়ি আসে আর ঝড়টা থেমে যায়।

পরদিন সকালে ঝড় একটু কমলে আমি বাইরে বের হই। চারপাশের দৃশ্য দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বড় বড় গাছ উপড়ে রাস্তার ওপর পড়ে ছিল, পাড়ার বেশ কিছু বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছিল, আর আমাদের উঠোন ঢেকে ছিল ভাঙা ডাল আর পাতায়। আমাদের পরিবার ভাগ্যবান ছিল যে তেমন কোনো বড় ক্ষতি হয়নি, তবে আশেপাশের অনেকের জন্যই সময়টা ছিল ভীষণ কষ্টের। কয়েকটা বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আর সব কিছু স্বাভাবিক করতে মানুষকে টানা কয়েকদিন ধরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে হয়েছিল।

ঝড়ের পরের দিনগুলো ছিল আরও কঠিন। যাতায়াত ব্যাহত হচ্ছিল, জল আর বিদ্যুৎ আসছিল- যাচ্ছিল। আমাদের স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ক্লাস স্থগিত রাখা হয়েছিল। তবে এত কষ্টের মাঝেও আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে একে অপরকে সাহায্য করার সেই দৃশ্যগুলো। প্রতিবেশীরা সবাই সবার ঘর পরিষ্কারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। উদ্ধারকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা এসে রসদ পৌঁছে দিচ্ছিলেন। আমিও বাবা-মাকে উঠোন ঝাড়ু দিতে আর ছোটখাটো কাজে সাহায্য করেছিলাম।

সেই ঝড় আমাকে শিখিয়েছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে-কয়ে আসে না। তাই নিজেদের ও পরিবারকে নিরাপদ রাখতে আগে থেকেই সতর্ক ও প্রস্তুত থাকা জরুরি। বিপদ এলে সবাই একসাথে মিলে মোকাবিলা করার গুরুত্বও আমি সেদিন বুঝেছিলাম। মানুষ যদি একে অপরের পাশে দাঁড়ায়, তবে দুর্যোগের ক্ষতি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব।

আমি আশা করি ভবিষ্যতে স্কুলে শিক্ষার্থীদের দুর্যোগ মোকাবিলার উপায় শেখাতে আরও বেশি ব্যবহারিক কার্যক্রম থাকবে। আর বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই: কখনো আবহাওয়ার পূর্বাভাস হেলাফেলা করো না। সবসময় প্রস্তুত থাকবে এবং বড়দের পরামর্শ মেনে চলবে। সেই ঝড় আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল সত্যি, কিন্তু একই সাথে আমাকে সাহসী হতে, জীবনের ছোট ছোট জিনিসকে মূল্য দিতে এবং বিপদে সহানুভূতির শক্তি কতখানি তা বুঝতে শিখিয়েছে।



সূত্র : © ট্রান হা মাই
বন্যা ত্রাণ প্রচেষ্টা (Tiếp Tế Vùng Lũ)

শিক্ষার্থীর নোট: বন্যার জল একসময় শুকিয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু মানুষের মমতাবোধ, ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা আর একসাথে থাকার শিক্ষা চিরকাল থেকে যাবে। এই বন্যা আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান এই শিক্ষাটিই দিয়ে গেছে।

(৫ম শ্রেণি; ইয়েন লুং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়; কোয়াং ইয়েন)

ঝড়-বন্যার মাঝে এক প্রদীপ, আর সহনশীলতার শিক্ষা

এনগো হোয়াং আনহ লিনহ

ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলের একটি উপকূলীয় জেলায় আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। প্রতি বছর ঝড়ের মরশুম এখানে কোনো না কোনো গভীর ক্ষত রেখে যায়। তবে দুই বছর আগে আমাদের শহরে আঘাত হানা সেই ঐতিহাসিক ঝড়টি আমি কখনো ভুলতে পারব না।

ঝড়ের সতর্কসংকেত বাজছিল, চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল, আর দরজার ফাঁক গলে বাতাসের এক ভয়ানক হা-হু শব্দ আসছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বন্যার জল দ্রুত বেড়ে গ্রামের রাস্তাঘাট ভাসিয়ে সোজা আমাদের উঠানে ঢুকে পড়ে। কর্দমাক্ত, উত্তাল সেই জলের স্রোত ধেয়ে আসতে দেখে ছোট মনটাতে প্রকৃতির এই রূপ দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।

সেই ঝড় আমাদের স্বাভাবিক জীবনকে এক লহমায় তছনছ করে দিল। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, মোবাইলের নেটওয়ার্ক উধাও হয়ে গেল; চারপাশের জলে আমাদের বাড়িটি যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হলো। আমাদের স্কুল জলে ডুবে যাওয়ায় পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। উঁচুতে তুলে রাখার পরও আর্দ্রতায় আমার বই খাতা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে বড় সংকট দেখা দিল তিন দিন পর-যখন আমাদের কাছে জমে থাকা খাবার আর পানীয় জল প্রায় শেষ হয়ে এলো।

এই চরম কষ্টের দিনে পরিবারের বন্ধনই ছিল আমাদের একমাত্র শক্তি। বাবা বুক সমান জলে নেমে বাতাসের তোড়ে আলগা হয়ে যাওয়া টিনের চাল মেরামত করছিলেন, আর মা মেপে মেপে পানীয় জল ব্যবহার করে ছোট একটি গ্যাসে নুডুলস ফুটিয়ে আমাদের দিচ্ছিলেন। রাতে মোমবাতির টিমটিমে আলোয় আমরা সবাই এক হয়ে বসে গল্প করতাম, যাতে শীত আর ভয় কম অনুভব হয়। জল কমতে শুরু করলে চারিদিকে কেবল কাদা আর আবর্জনার স্তুপ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবেশীরা যেভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি ঠিক করতে ও পরিষ্কার করতে একে অপরের পাশে এসে দাঁড়াল, তা দেখে বুঝেছিলাম-এই ধ্বংসস্তূপের মাঝ থেকেই আবার নতুন জীবনের সূচনা হচ্ছে। আজ আমার শহর আবার সবুজ হয়ে উঠেছে, ঘরবাড়ি আগের চেয়ে শক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছে, জীবনও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছে।

সেই অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়তো ধন-সম্পদ কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে কখনো হারানো যায় না। আমি বুঝেছি-দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হলে সবসময় আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে, কখনো উদাসীন থাকা চলবে না। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এলে কীভাবে পর্যাণ্ড জল ও ব্যাকআপ বিদ্যুৎ জমিয়ে রাখতে হয়, কিংবা কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা ও সারভাইভাল দক্ষতা ব্যবহার করতে হয় তা আমি ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছি।

আমি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অনুরোধ জানাতে চাই: তরুণদের জন্য দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবহারিক মহড়ার ব্যবস্থা করা হোক এবং একটি আধুনিক স্মার্ট অ্যালার্ট অ্যাপ চালু করা হোক, যাতে সবাই সময়মতো নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে।

সহপাঠী ও বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমার বার্তা: "দুর্যোগ একদিকে বিশাল প্রতিবন্ধকতা হওয়া সত্ত্বেও এটি মানুষের ঐক্যের শক্তিকেও প্রকাশ করে। জ্ঞান অর্জন করো, মনকে ইতিবাচক রাখো এবং একে অপরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকো। আমরা তরুণরা যদি সচেতন থাকি, তবে যেকোনো ঝড়ের মুখেই আমরা আমাদের পরিবার ও সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী ঢাল হয়ে উঠতে পারব।"

(৬ষ্ঠ শ্রেণি; ইয়েন হুং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়; কোয়াং ইয়েন)

উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার

নগোক ডুং

সেপ্টেম্বরের এক বিকেলে আমাদের শহর কোয়াং ইয়েনে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম এটা হয়তো আর পাঁচটা স্বাভাবিক ঝড়ের মতোই, কারণ ভিয়েতনামে এ সময়ে বৃষ্টি হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই রেডিওতে শুনতে পেলাম 'ইয়াগি' নামের এক প্রলয়ংকরী সুপার টাইফুন ধেয়ে আসছে। বাতাসের বেগ হু হু করে বাড়তে লাগল, জানালার বাইরের গাছগুলো দুমড়ে-মুচড়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর জল উপচে আমাদের রাস্তায় ঘোলাটে বাদামী স্রোত বয়ে চলল। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়ায় বাবা-মা আমাকে আর আমার ছোট বোনকে ঘরের ভেতর থাকতে বললেন। জল বাড়তে বাড়তে একসময় আমাদের বাড়ির সিঁড়ি ছুঁয়ে ফেলল। জীবনে এত ভয় আমি কখনো পাইনি।

জল ক্রমাগত বাড়তে থাকায় আমরা দোতলায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। চারপাশের বহু বাড়ি ততক্ষণে জলে ডুবে গেছে, অন্যান্য পরিবারগুলোও দোতলায় আশ্রয় নিচ্ছিল। প্রতিবেশীরা জানালা দিয়ে একে অপরকে ডেকে খবর নিচ্ছিল সবাই নিরাপদ আছে কি না। এর মধ্যেই হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল, ফলে ফোনে বা ইন্টারনেটে আর খবর দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। বাবা একটি ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে কিছু খাবার, পানীয় জল, প্রয়োজনীয় ওষুধ, ফ্ল্যাশলাইট ও ব্যাটারি গুছিয়ে নিলেন। আমরা দোতলায় শান্ত হয়ে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পরদিন সকালে জল আরও বেড়ে যায়। জানালা দিয়ে দেখছিলাম মোটরবাইকগুলো প্রায় পুরোটাই জলের নিচে তলিয়ে গেছে, আর কাঠের টুকরো ভেসে যাচ্ছে রাস্তায়। কিছুক্ষণ পর দেখলাম উদ্ধারকারীরা ছোট ছোট নৌকো নিয়ে মানুষকে উদ্ধার করতে বের হয়েছেন। এর মধ্যেই একটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার আমাদের পাড়ার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এবং নিচে ঝুড়ি নামিয়ে এক একা থাকা বয়স্ক দাদুকে উদ্ধার করল, যিনি আটকে পড়েছিলেন। দৃশ্যটি দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হলো—উপলব্ধি করলাম যে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকলেও আমাদের বাঁচাতে অনেকেই নিজেদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলছেন।

আমরা দুই দিন দোতলায় আটকে ছিলাম। মেপে মেপে খাবার খেতাম আর একটি ছোট ব্যাটারি-রেডিওতে খবরের আপডেট শুনতাম। মা বারবার বলছিলেন, অন্তত মাথার ওপর একটা শুকনো ছাদ আছে বলে আমরা ভাগ্যবান। অবশেষে জল ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল এবং উদ্ধারকারী নৌকাগুলো আমাদের মতো পরিবারদের খোঁজ নিতে এলো।

জল পুরোপুরি নেমে গেলে নিচে নেমে দেখি নিচতলা কাদা আর পলিমাটিতে ঢেকে গেছে। বইপত্র, আসবাবপত্র সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঘর পরিষ্কার করতেই কয়েক দিন লেগে যায়। আমাদের স্কুলের কিছু শ্রেণীকক্ষ প্লাবিত হওয়ায় মেরামত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বন্ধুদের কাছে শুনলাম তারাও স্কুলের জিনিসপত্র, পোষা প্রাণী বা ফলগাছ হারিয়েছে। সময়টা খুব কঠিন ছিল, তবে শিক্ষকেরা আমাদের শক্ত থাকতে ও একে অপরের পাশে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রতিবেশীরা সবাই মিলে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিল।

এই ঘটনা আমাকে শিখিয়েছে যে ইয়াগির মতো টাইফুন কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই হঠাৎ আঘাত হানতে পারে। তাই প্রতিটি পরিবারের সবসময় প্রস্তুত থাকা উচিত—একটি জরুরি প্রয়োজনীয় ব্যাগ গুছিয়ে রাখা, আবহাওয়া সতর্কবার্তা মেনে চলা এবং জল বাড়লে দ্রুত উঁচুতে আশ্রয় নেওয়া। আমি আশা করি কোয়াং ইয়েনে ভবিষ্যতে আরও মজবুত বাঁধ ও উন্নত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

অন্যান্য শিশুদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই: কখনো ঝড়ের সতর্কবার্তা হালকাভাবে নেবে না। আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে এবং একে অপরকে সাহায্য করলে আমরা যত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগই আসুক না কেন, তা অতিক্রম করতে পারব।

(৫ম শ্রেণি; ইয়েনহুং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়; কোয়াং ইয়েন)

হতাশা থেকে আশার পথে

লে ফুওক থাও উয়েন

কোয়াং ইয়েন এমন একটি জায়গা যেখানে প্রায়ই ঝড়-বন্যা হয়। ছোটবেলা থেকেই ঝড়ের কথা শুনে আসছি, তাই ভাবতাম আমি এতে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই বিশাল বন্যাটির কথা আমি কোনোদিন ভুলব না-যখন দিন-রাত টানা বৃষ্টিতে নদীর জল হু হু করে বেড়ে গিয়েছিল। তখনই প্রথম বুঝেছিলাম কীভাবে একটি দুর্যোগ মাত্র কয়েক দিনে মানুষের চেনা জীবনকে তছনছ করে দিতে পারে। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম সত্যি, তবে সেই বিপদ থেকেই ভাগ করে নেওয়া ও আশার এক নতুন পাঠ পেয়েছিলাম।

বন্যা আসার আগে কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম এটা হয়তো সাধারণ বৃষ্টি। কিন্তু এক রাতে জল এত দ্রুত বাড়ল যে উঠোন ছাড়িয়ে সোজাসুজি ঘরে ঢুকে পড়ল। বাবা-মা তাড়াহুড়ো করে টেবিল, চেয়ার, ফ্রিজ আর দরকারি জিনিসপত্র উঁচুতে তুলে রাখলেন। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার আশঙ্কায় খাবার, জল, টর্চ আর পাওয়ার ব্যাংক গুছিয়ে রাখা হলো। বাইরে যখন কাদার স্রোত বয়ে যেতে দেখলাম, বুকের ভেতরটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল। শুধু ভাবছিলাম বৃষ্টিটা কখন থামবে, কখন সব আবার আগের মতো হবে।

বন্যার সেই দিনগুলো ছিল ভীষণ দুর্ভোগের। সুরক্ষার স্বার্থে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছিল, ফোনের নেটওয়ার্কও ছিল না বললেই চলে। চলাচলের একমাত্র উপায় ছিল নৌকো। জল এত বেশি ছিল যে অনেক পরিবার দিনের পর দিন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটকে ছিল। তবে এই কঠিন পরিস্থিতিতেও মানুষের মানবিক রূপ ফুটে উঠেছিল। যাদের কাছে নুডুলস বা শুকনো খাবার ছিল, তারা খাবারহীন প্রতিবেশীদের সাথে তা ভাগ করে নিচ্ছিল। যাদের নৌকো ছিল, তারা বয়স্ক ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিচ্ছিল। আমার এখনো মনে আছে সেনা, পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকরা কীভাবে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মানুষের হাতে খাবার ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছে দিচ্ছিলেন। সেই দৃশ্য দেখে বুঝেছিলাম-সংকটের সময়ে ভালোবাসাই আমাদের আসল শক্তি।

কয়েক দিন পর জল নেমে গেলেও পেছনে ফেলে যায় ধ্বংসের ক্ষত। উঠোন ও ঘরবাড়ি কাদায় ভরে গিয়েছিল, গাছপালা ভেঙে পড়েছিল, আমাদের পড়াশোনা ও জীবনযাত্রা থমকে গিয়েছিল। পরিবার ও প্রতিবেশীরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিষ্কারের কাজ করত। সবাই ক্লান্ত ছিল, কিন্তু একে অপরকে সাহস যুগিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। মানুষকে এভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে দেখে আমি বুঝেছিলাম-একতা থাকলে যেকোনো বাধা অতিক্রম করা সম্ভব।

সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমরা হয়তো আটকাতে পারব না, তবে সচেতনতা, প্রস্তুতি ও পরিবেশ রক্ষার মাধ্যমে এর ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। এখন আমি পেটভরা খাবার, বিদ্যুৎ কিংবা একটা শুকনো মাথার ওপর ছাদের মতো ছোট ছোট বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারি।

আমি আশা করি ভবিষ্যতে কোয়াং ট্রির মতো ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মানুষকে সহায়তার জন্য আরও বড় পরিকল্পনা নেওয়া হবে। তরুণেরাও যেন দুর্যোগ সচেতনতা ও পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসে, যাতে আমরা একটি নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতে পারি। দুর্যোগ হয়তো ক্ষয়ক্ষতি আনে, কিন্তু একতা, মমতাবোধ ও আশাই আমাদের আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি দেয়।

(৮ম শ্রেণি; ইয়েনহুং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়; কোয়াং ইয়েন)

ঝড়ের মাঝেও মানবতা হুয়িং মিন থু

সময় অনেক স্মৃতি মুছে দেয়, কিন্তু বর্ষা এলেই আমার ২০২৩ সালের সেই সকালটার কথা মনে পড়ে যায়। তখন আমার বয়স মাত্র এগারো। পরিবারের সাথে হুয়াং নাইন-এ থাকতাম। সেবারই প্রথম জীবনে বড় কোনো টাইফুনের (টাইফুন নং ১) মুখোমুখি হয়েছিলাম। প্রলয়ংকরী বাতাস আর ভেঙে পড়া গাছের ডালের চেয়েও আমার মনে যে জিনিসটি বেশি দাগ কেটেছিল, তা হলো মানুষের মধ্যকার সহানুভূতি ও ভালোবাসার শক্তি।

ঝড় আঘাত হানার আগের দিনগুলোতে বড়দের মুখে কেবলই শুনছিলাম এটি কত ভয়ানক হতে যাচ্ছে। ছোট মাথায় ভেবেছিলাম ঝড় মানে হয়তো কেবল ভারী বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া-আর তার সাথে স্কুল থেকে কয়েক দিনের ছুটি! একটু উত্তেজিতই ছিলাম যে বাড়িতে বেশ খেলার সময় পাব। কিন্তু ২ আগস্টের সকালটি আমার সেই ভুল ধারণা ভেঙে দেয়।

বাতাসের বিকট গর্জন আর জানালার কাঁচ কাঁপার শব্দে খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। টিনের চালের ওপর ছুড়ে মারা বৃষ্টির শব্দে প্রতি মুহূর্তে আঁতকে উঠছিলাম। বাবা-মা তাড়াহুড়ো করে দরজাজানালা পরীক্ষা করছিলেন, আর আমাকে কাঁচের জানালা থেকে দূরে থাকতে বলছিলেন। প্রথমবার তাদের চোখেমুখে সত্যি সত্যি ভয়ের ছাপ দেখেছিলাম, আর তখনই বুঝলাম পরিস্থিতি কতটা গুরুতর। বিদ্যুৎ চলে গেলে পুরো ঘর একটি ছোট টর্চের আলোয় অন্ধ হয়ে রইল। টিভি নেই, ইন্টারনেট নেই-বাবা-মায়ের পাশে বসে শুধু বাইরের বাতাসের গর্জন শোনা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। ভয়ে ভয়ে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মা, ঝড় কখন থামবে?" মা শুধু একটু হেসে আমার চুলে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে সোনা, জলদিই থেমে যাবে।" মায়ের সেই শান্ত কথাটুকু আমাকে অনেক সাহস দিয়েছিল।

ঝড় থামার পর যখন বাবার সাথে বাইরে এলাম, চারিদিকের দৃশ্য দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। চেনা রাস্তাগুলো ভাঙা ডালপালা ও উপড়ে পড়া গাছে আটকে গেছে। টিনের চাল উবে গেছে, দোকানের সাইনবোর্ডগুলো ঝুলছে বাঁকা হয়ে। যে পাড়াটা সবসময় প্রাণবন্ত থাকত, সেটা মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝেই দেখলাম এক অপূর্ব দৃশ্য। কাউকে ডাকতে হয়নি-প্রতিবেশীরা নিজে থেকেই ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে লেগে পড়লেন। তরুণেরা ডালপালা সরাতে হাত বাড়াল। এক প্রতিবেশী কাকিমা যাদের ঘরে বিদ্যুৎ ও রান্নার সুযোগ ছিল না, তাদের জন্য গরম জাউ ভাত রান্না করে নিয়ে এলেন। আমিও বাবার সাথে উঠোন পরিষ্কারে সাহায্য করলাম। ছোট ছোট এই কাজগুলো করে আমার মনে হচ্ছিল আমিও পাড়াকে আবার আগের রূপে ফেরাতে সাহায্য করছি। সেদিন বুঝেছিলাম-প্রকৃতির শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কেবল বীরত্ব নয়, বিপদের দিনে একে অপরকে আঁকড়ে ধরে রাখার নামই আসল শক্তি।

টাইফুন নং ১ আজ অনেক অতীত। সেই ১১ বছরের ছোট্ট মেয়েটি আমি আর নেই, যে ঝড়ের খবর শুনলে ছুটির আনন্দ পেত। এখন বর্ষা এলেই আবহাওয়ার খবরের দিকে খেয়াল রাখি, পরিবারকে প্রস্তুতিতে সাহায্য করি। তবে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি পেয়েছি তা হলো-ঐর্ষ্য, প্রস্তুতি আর সহমর্মিতাই দুর্যোগ মোকাবিলার মূল অস্ত্র। ঝড় হয়তো গাছ উপড়ে ফেলতে পারে বা চাল উড়িয়ে নিতে পারে, কিন্তু মানুষের ভেতরের দয়া ও সহানুভূতিকে কখনো ধুয়ে মুছে নিয়ে যেতে পারে না।



সূত্র : © হুয়িং মিন থু

Aftermath of Typhoon No. 1 in Quang Ninh

(৯ম শ্রেণি; ইয়েনলুং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়; কোয়াং ইয়েন)

ঝড়ের পর শুরু হলো নতুন লড়াই

নগুয়েন কুওক বাও নগান

আগে কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করত দুর্যোগের সবচেয়ে ভীতিকর দিক কোনটা-আমি হয়তো বলতাম ধৈর্যে আসা বাতাস, মুশলধারে বৃষ্টি বা বন্যার জল। কিন্তু নিজে একটা বড় ঝড়ের মুখোমুখি হওয়ার পর বুঝলাম, আসল কঠিন সময়টা ঝড় চলার সময় নয়; আসল লড়াই শুরু হয় ঝড়ের পরের দিনগুলোতে-যখন ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে জীবনকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হয়।

ঝড় যখন আঘাত হানে, আমাদের একমাত্র চিন্তা ছিল সবাই যাতে সুস্থ থাকি। দরজা-জানালা বন্ধ করে, বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিয়ে, টর্চ হাতে আমরা এক ঘরে জড়ো হয়েছিলাম। বাইরে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ আর চালের ওপর বৃষ্টির তাণ্ডবে সবার মনেই উদ্বেগ ছিল। কেউ কিছু বলছিল না, কিন্তু সবার নীরবতাই বলে দিচ্ছিল ভয়ের কথা। সকালে বাতাসের বেগ কমলে আমরা সাহস করে বাইরে বের হই।

বাইরে যা দেখলাম তা আমাদের সেই চেনা শহরের মতো ছিল না। রাস্তাঘাট নোংরা আবর্জনায় ঢেকে গেছে, বহু বাড়ির চাল উড়ে গেছে, দোকানে জল ঢুকে থমকে গেছে ব্যবসা। বিদ্যুৎ নেই, জল নেই, মোবাইলের নেটওয়ার্কও বিচ্ছিন্ন। হঠাৎ করে প্রতিদিনের অতি পরিচিত জীবনটা কঠিন হয়ে উঠল। যে বিষয়গুলোকে আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিই-যেমন আলোর বোতাম টিপলেই আলো জ্বলা, কল খুললেই জল কিংবা সময়মতো খাবার-সেগুলোর গুরুত্ব সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

ঝড়ের পরের দিনগুলোর কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। বাবা-মাকে খুব ভোরে উঠে ঘরদোর পরিষ্কার করতে দেখতাম। যে প্রতিবেশীরা আগে কেবল যাতায়াতের পথে সৌজন্যমূলক হাসতেন, তারা এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছেন, গাছ কাটছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করছেন। কেউ শুকনো রুটি আনছেন, কেউ পানীয় জল দিচ্ছেন, আবার কেউ নিজের জেনারেটর শেয়ার করছেন। সেখানে কেউ কাউকে অচেনা ভাবেনি-সবাই বুঝেছিল এই সংকট কাটাতে হবে একসাথে।

সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম সহমর্মিতা কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ কোনো শব্দ নয়; এটি মানুষের কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানোর বাস্তব শক্তি। এক প্রবীণ মানুষ ভাঙা ঝাড়ু নিয়ে প্রতিবেশীর উঠোন পরিষ্কার করছেন কিংবা তরুণ স্বেচ্ছাসেবকেরা বৃষ্টিতে ভিজেই রাস্তা থেকে গাছ সরিয়েছেন-এই দৃশ্যগুলো সেই দুর্যোগের মধ্যেও মনকে উষ্ণ করে দিয়েছিল।

এই অভিজ্ঞতার পর জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। আগে একটু বিদ্যুৎ গেলে বা সামান্য বৃষ্টিতে প্ল্যান ভেঙে গেলে বিরক্ত হতাম। কিন্তু এখন বুঝি, মাথার ওপর শক্ত ছাদ থাকা, পরিবারের সাথে দু'বেলা খেতে পাওয়া বা একটা শান্ত পরিবেশ পাওয়া কত বড় আশীর্বাদ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়তো আমরা পুরোপুরি থামাতে পারব না, কিন্তু নিজেদের সচেতনতা ও সঠিক প্রস্তুতি দিয়ে এর ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যই কমাতে পারি।

আজ যখনই খবরে কোনো ঝড়ের পূর্বাভাস দেখি, আমি কেবল বাতাসের গতিবেগ নিয়ে ভাবি না; ভাবি সেই পরিবারগুলোর কথা যারা ঘরের চাল সুরক্ষায় ব্যস্ত, সেই কৃষকদের কথা যাদের ফসল নষ্ট হতে বসেছে, কিংবা সেই শিশুদের কথা যাদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে।

সহপাঠী ও তরুণদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই বার্তা: শান্তির দিনগুলোর গুরুত্ব দাও, দুর্যোগকে কখনো হালকাভাবে নিয়ো না। নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে প্রস্তুত রাখো এবং বিপদে পড়া মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। কারণ ঝড়ের পর একটা সমাজকে পুনর্গঠন করতে কেবল নতুন ইট-কাঠের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও ঐক্যের।

(১০ম শ্রেণি; ইয়েনলুং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়; কোয়াং ইয়েন)

যখন লালচে পানি সব ভাসিয়ে নিল: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ফাম ডিয়েম কুইনহ

আমার জন্ম ভিয়েতনামের মধ্যপ্রদেশের রৌদ্রদগ্ধ ও ঝড়-প্রবণ এলাকায় নয়। কিন্তু সেবার বন্যার চরম মুহূর্তে হা তিনহ-এর হুয়ং খে এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার পুরো চিন্তাভাবনাই বদলে দিয়েছিল। সেটি ছিল এক ঐতিহাসিক বন্যা মরশুম, যা আমি জীবনভর মনে রাখব। প্রথমবার কোনো টিভি স্ক্রিনে নয়, নিজের চোখে প্রকৃতির সংহারী রূপ দেখেছিলাম। মাত্র এক রাতের অব্যাহত বৃষ্টিতে উজান থেকে নেমে আসা ঘোলা জল পুরো গ্রামকে এক লালচে-বাদামী সাগরে পরিণত করেছিল। উঁচু জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া পুরো গ্রামটির দিকে তাকিয়ে নিজেকে ভীষণ অসহায় আর ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল।

জল যখন সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিল, তখন মানুষের জীবন ছবির হয়ে যায়। বিদ্যুৎ ও ফোন নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন থাকায় উদ্ধারকারীদের সাথে যোগাযোগ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল জলে নেমে হাঁটা কিংবা ছোট ডিঙি নৌকা। পানীয় জল ও খাবারের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। ছাদে উঠে বয়স্ক ও শিশুদের সাহায্যের জন্য হাত নাড়াতে দেখা কিংবা একটু শুকনো নুডুলস সম্বল করে দিন কাটানো পরিবারগুলোকে দেখে বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল।

কিন্তু সেই কঠিন দুর্যোগের মাঝেই মানুষের সহমর্মিতার এক অনন্য রূপ দেখেছিলাম। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকা চালিয়ে বন্যাকবলিত অঞ্চলে রসদ পৌঁছে দিচ্ছিলেন। জল একটু কমলে গ্রামবাসীরা নিজেরা কোদাল-বেলচা নিয়ে নেমে পড়লেন কাদা পরিষ্কার করতে। গ্রামটি আবার ধীরে ধীরে নতুন প্রাণ পেতে শুরু করল।

আমার সবচেয়ে স্পষ্ট মনে আছে এক প্রবীণ কাকিমার ঘর পরিষ্কার করার ঘটনাটি। বন্যায় তাঁর প্রায় সব জিনিসপত্রই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবুও তিনি মুখে একটু হাসি এনে বলেছিলেন—“মানুষগুলো বেঁচে আছে, এটাই বড় কথা। জিনিসপত্র আবার গড়ে নেওয়া যাবে।” তাঁর এই সাধারণ কথাটি আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। বুঝেছিলাম, দুর্যোগের পর মানুষকে আবার উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে মানুষের উৎসাহ আর আন্তরিক সাহচর্য।

এই সফর আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছে যা কোনো ক্লাসরুমে শেখা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এলে আমাদের প্রস্তুতি আরও শক্ত হতে হবে—বাড়ির উঁচুতে টর্চ, শুকনো খাবার ও ওষুধসহ ‘সারভাইভাল ব্যাগ’ রাখা এবং স্থানীয়ভাবে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র বা ভাসমান বাড়ি তৈরি করা জরুরি।

তরুণদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই: প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়তো ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিতে পারে, কিন্তু মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও একতাকে কখনো ভেঙে দিতে পারে না। আসুন আমরা প্রকৃতিকে রক্ষা করি, বৃক্ষরোপণ করি এবং বেঁচে থাকার সঠিক দক্ষতা অর্জন করি—কারণ প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানেই নিজেদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করা।

(১১শ শ্রেণি; ইয়েনহুং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়; কোয়াং ইয়েন)

ঝড় পরবর্তী পুনরুত্থান

লু ক্রুং সন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কখন যে হঠাৎ এসে মানুষের জীবন পুরোপুরি বদলে দেয়, তা আগে থেকে বলা যায় না। আমার জীবনের এমনই একটি অভিজ্ঞতা, যা আজও খুব স্পষ্ট মনে আছে, সেটি হলো ২০২২ সালে দা নাং এ আঘাত হানা সেই ঝড়। তখন পরিবারের সঙ্গে দা নাং এ কাটানো দুই বছরের মধ্যে ছিলাম আমি, আর সেই বছরের অক্টোবর মাসটি শেষ পর্যন্ত এমন এক মাস হয়ে উঠেছিল, যা কোনোদিন ভুলতে পারব না।

ঝড়টি ছিল ভয়ংকর শক্তিশালী। প্রবল বৃষ্টি, তীব্র বাতাস আর চারপাশজুড়ে বিশৃঙ্খলা যেন পুরো শহরটাকেই গ্রাস করেছিল। আমাদের পরিবারের জন্য এটি শুধু কয়েকটি কঠিন দিন পার করে যাওয়ার ঘটনা ছিল না। এর প্রভাব আমার পড়াশোনার ওপরও এমনভাবে পড়েছিল, যা আগে কখনো ভাবিনি।

ঝড় যখন সত্যিই আঘাত হানল, আবহাওয়া একেবারে ভয়ংকর হয়ে উঠল। ঘন্টার পর ঘন্টা বাতাস হু হু করে বইছিল, আর বৃষ্টিও যেন থামার নামই নিচ্ছিল না। দা নাংয়ের বিভিন্ন সড়ক পানিতে ডুবে গেল, ফলে কোথাও যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। কোথাও কোথাও বিদ্যুৎ চলে গেল, সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ইন্টারনেটও। নিরাপদ থাকার জন্য আমরা সবাই ঘরের ভেতরেই থাকলাম এবং সামনে কী হতে পারে, তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

সেই সময়টা আমার ভীষণ উদ্বেগে কেটেছিল। এর আগে এত ভয়ংকর কোনো ঝড়ের মধ্যে আমাকে থাকতে হয়নি। একদিকে পরিবারের সবার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল, অন্যদিকে মনে হচ্ছিল, স্কুলের পড়াশোনায় কতটা পিছিয়ে পড়ব।

পরে বুঝলাম, সেই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিরাপদ রাখার জন্য কিছুদিন স্কুল বন্ধ রাখা হলো। ফলে ক্লাস বাতিল হয়ে গেল এবং স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনায় অংশ নেওয়া সম্ভব হলো না। পরে অনলাইন ক্লাস শুরু হলেও ইন্টারনেটের অস্থিতিশীল সংযোগের কারণে ঠিকমতো ক্লাসে যোগ দেওয়াই কঠিন হয়ে পড়ল, শিক্ষকের কথা বুঝে অনুসরণ করা তো আরও কঠিন। তার ওপর বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় অনেক সময় ল্যাপটপ চার্জ দেওয়া বা ব্যবহার করাও সম্ভব হতো না। ফলে কিছু অ্যাসাইনমেন্ট স্থগিত রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। ধীরে ধীরে এমন সব পড়াশোনার কাজে পিছিয়ে পড়তে লাগলাম, যেগুলো সাধারণ সময়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ করে ফেলতাম।

তবে শুধু আমার পড়াশোনাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ঝড়ের সময় ও পরে আমাদের পরিবারকেও বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে লড়তে হয়েছে। বাতাসে ছাদের কিছু অংশ ও বেড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, মেরামতের প্রয়োজন পড়েছিল। এমনকি প্রতিদিনের সাধারণ কাজগুলোও হঠাৎ অনেক বেশি কঠিন হয়ে গিয়েছিল। বাইরে বের হওয়া নিরাপদ ছিল না, এমনকি নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে আনাও কঠিন হয়ে পড়েছিল, কারণ অনেক দোকান বন্ধ ছিল।

তারপরও আমরা একে অন্যকে পাশে রেখে পরিস্থিতি সামলে উঠেছিলাম। আবহাওয়া স্বাভাবিক হওয়ার পর ধীরে ধীরে জীবনও আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করল।

পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, এই অভিজ্ঞতা আমাকে এমন কিছু শিখিয়েছে, যা অন্য কোনোভাবে হয়তো শেখা সম্ভব হতো না। বুঝেছি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত থাকা কোনোভাবেই হালকাভাবে নেওয়ার বিষয় নয়। বিপদ সত্যিই সামনে না আসা পর্যন্ত আমরা সহজেই ধরে নিই, হয়তো পরিস্থিতি এতটা খারাপ হবে না।

এছাড়াও কঠিন সময়ে মানুষ যে কতটা একে অন্যের ওপর নির্ভর করে, তা বুঝতে পেরেছি। সবাই যখন নিজের জায়গা থেকে একটু করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন কঠিন পরিস্থিতিও অনেক সহজে সামলানো যায়। ভবিষ্যতে এমন কিছু আবার ঘটলে আমি আগে থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত রাখব, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো

নিরাপদে রাখব এবং পড়াশোনার সময়সূচিও এমনভাবে সাজাব, যাতে জরুরি পরিস্থিতির জন্য কিছুটা নমনীয় থাকে।

ভবিষ্যতে আমি আশা করি, আমাদের সমাজ, বিশেষ করে স্কুলগুলো, এমন পরিস্থিতির জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নেবে। সেটা হতে পারে আরও পরিষ্কার জরুরি নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে কিংবা সরাসরি ক্লাস করা সম্ভব না হলে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার আরও কার্যকর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে।

আমার বয়সী অন্যদের যদি এই অভিজ্ঞতা থেকে একটি কথাই বলতে হয়, তবে সেটি হবে—কঠিন সময়ে শান্ত থাকো, দায়িত্বশীল থাকো এবং অন্যদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকো।

২০২২ সালের সেই ঝড় পার করা সহজ ছিল না। কিন্তু এখন পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, সেই অভিজ্ঞতা আমাকে কিছুটা বেশি দৃঢ় করেছে এবং সামনে যা-ই আসুক, তার জন্য অনেক বেশি প্রস্তুত করে দিয়েছে।

(দ্বাদশ শ্রেণি; ইয়েন হুং প্রাইমারি, সেকেন্ডারি অ্যান্ড হাই স্কুল, কোয়াং ইয়েন)

একটা নৌকা!

লে দাং কুয়াং

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে টাইফুন রাগাসা কোয়াং নিনে আঘাত হানে। টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে নদীগুলো উপচে পড়ে, আর আমাদের মতো শহরগুলো দিনের পর দিন পানির নিচে ডুবে থাকে।

বাবা বন্দরে মেরিন মেকানিকের কাজ পাওয়ার পর আমরা মাত্র কয়েক মাস আগে কোয়াং নিনে এসেছিলাম। তাই বাড়ি যখন আঘাত হানে, তখনও নতুন জায়গাটাকে ঠিকমতো চিনে উঠতে পারিনি।

আমার সবচেয়ে বেশি মনে আছে শব্দটা—টানা তিন দিন ধরে বৃষ্টি থামার কোনো নামই ছিল না। টিনের চালে বৃষ্টির এমন শব্দ হচ্ছিল যে ঘরের কেউই ঠিকমতো ঘুমাতে পারছিল না।

দ্বিতীয় দিনের সকালেই আমাদের গেটের সামনের রাস্তার আর কোনো চিহ্ন রইল না। সেখানে তখন বাদামি রঙের পানি ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। দরজার সামনে পানি ইতিমধ্যে গোড়ালি ছাড়িয়ে গেছে, আর তখনও তার উচ্চতা বাড়ছিল।

ঠিক তখনই আমাদের প্রতিবেশীর ছেলে একটা পুরোনো কাঠের নৌকা নিয়ে হাজির হলো। নৌকাটা দুজনের বেশি মানুষ ধরার মতো বড়ও ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল, আমি তার সঙ্গে গিয়ে সামনের বাড়িগুলোর অবস্থা দেখে আসতে চাই কি না।

আমি সামনে বসলাম, আর সে আমার পেছনে। তার হাতে ছিল ভাঙা এক টুকরো কাঠ, সেটাকেই বৈঠার মতো ব্যবহার করছিল। আসল বৈঠাটা কয়েক সপ্তাহ আগেই হারিয়ে গিয়েছিল।

আমরা নিজেদের গেটের সামনে থেকেই নৌকা ঠেলে পানিতে নামলাম।

অদ্ভুত এক অনুভূতি ছিল সেটা। যে রাস্তার নামও তখনো আমার কাছে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে ওঠেনি, সেই রাস্তার সাইনবোর্ডের পাশ দিয়ে নৌকায় ভেসে যাচ্ছি, অথচ পানির নিচে ডুবে যাওয়ায় সাইনবোর্ডের শুধু ওপরের অংশটুকুই দেখা যাচ্ছে। যে জায়গাটাকে আমি সবে চিনতে শুরু করেছিলাম, সেটাই যেন ইতিমধ্যে অর্ধেক হারিয়ে গেছে।

আরও সামনে গিয়ে দেখলাম, মানুষ যে যার মতো করে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ কেউ দেয়ালের পাশে জমে থাকা ভাঙা ডালপালা আর আবর্জনার স্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কখন কোনো নৌকা তাদের কাছে আসবে।

পথজুড়ে প্লাস্টিকের বোতল আর কাঠের টুকরো পানিতে ভেসে যাচ্ছিল। চারপাশে আর তেমন কোনো শব্দ ছিল না—শুধু পানিতে বৈঠা ডোবার আর ওঠার মৃদু শব্দ।

আমরা ফিরে আসার আগেই আমার নিজের পরিবার জিনিসপত্র দোতলায় তোলা শুরু করে দিয়েছিল। আমাদের বাড়িটা হারাইনি, কিন্তু নিচে রাখা অনেক কিছুই আর রক্ষা করা যায়নি।

চালের বস্তা, বাবার কাজের সরঞ্জাম, মায়ের পুরোনো চিঠির একটি বাক্স, আর আমাদের পরিবারের বেদির ছবিগুলো—সব হারিয়ে গেল। হাতের নাগালে থাকা যা কিছু ছিল, যতটা সম্ভব ওপরে তুলে নেওয়া হয়েছিল। তারপরও কিছু জিনিস বাঁচানো যায়নি।

প্রায় এক সপ্তাহ আমাদের বিদ্যুৎ ছিল না, ছিল না পরিষ্কার পানিও। মা ছাদ থেকে সংগ্রহ করা বৃষ্টির পানি ফুটিয়ে ব্যবহার করতেন।

স্কুলও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, কারণ স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটার অবস্থাও আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার মতোই ছিল।

বাবা বন্দরে মেরিন মেকানিক হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু সব নৌকা তখন বন্দরে আটকে ছিল এবং পুরো এলাকা পানিতে ডুবে যাওয়ায় তাঁর করার মতো কোনো কাজ ছিল না। কাজ থাকলেও সেখানে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না।

আত্মীয়রা যখন পারতেন, নৌকায় করে খাবার পাঠাতেন। বেশিরভাগ সময় সেটাই ছিল আমাদের খাবার।

সত্যি বলতে, পুরো সময়টাই আমি ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই ছোট্ট নৌকায় আমাদের পাড়ার ভেতর দিয়ে ঘুরে বেড়ানোর একটা অনুভূতিও আমার মনে আছে—মনে হচ্ছিল, এতক্ষণ শুধু অপেক্ষা না করে অন্তত কিছু একটা করছি। পানির ভাগ্য কী হবে, তার হাতে নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে যেন নিজের মতো করে কিছু করার চেষ্টা করছি।

ঝড়ের পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করতে প্রায় এক মাস লেগেছিল। কাদা সবকিছুর ভেতরে ঢুকে যায়। পানি চলে যাওয়ার অনেক দিন পরও দেয়ালের ভেতর সেই গন্ধ থেকে যায়।

একটা জিনিস যদি বদলাতে পারতাম, তাহলে সেটাই বদলাতাম: আগে থেকেই জেনে রাখতাম, কোন প্রতিবেশীর কাছে নৌকা আছে। আর ঝুঁকির মৌসুম আসার আগেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো উঁচু জায়গায় তুলে রাখতাম।

আমাদের রাস্তার মানুষদের শেষ পর্যন্ত যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল, তা ছিল কোনো বড় পরিকল্পনা বা সতর্কবার্তা নয়। ছিল একজন প্রতিবেশীর পুরোনো একটা নৌকা আর বৈঠার বদলে হাতে ধরা একটা ভাঙা ডাল।

তুমি যদি এমন কোনো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়ে থাকো, পরের বার আবার এমন কিছু ঘটলে ভয় লাগতেই পারে। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু বন্যার পানি যখন সত্যিই তোমার দরজায় এসে পৌঁছাবে, তখন তুমি নিজেই হয়তো অবাক হয়ে যাবে—তুমি আসলে কতটা কিছু করতে পারো।

পরের ঝড় আসার আগেই পরিবারের সঙ্গে বসে কথা বলো। সত্যিই যদি আবার এমন পরিস্থিতি আসে, তখন কে কী করবে, সেটা আগে থেকেই ঠিক করে রাখো।

বৃষ্টি এই জায়গায় আবার ফিরে আসবেই।

কোনো এক অদ্ভুত কারণে, আমরাও ফিরে আসি।

(দ্বাদশ শ্রেণি; ইয়েন হুং প্রাইমারি, সেকেডারি অ্যান্ড হাই স্কুল, কোয়াং ইয়েন)

২০২০ সালের মধ্য ভিয়েতনামের বন্যা: সৈনিকদের আত্মত্যাগ

হোয়াং তাম বিন

১. কী ঘটেছিল?

আমি কোয়াং নিন প্রদেশের একটি ছোট গ্রামীণ এলাকার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। ২০২০ সালে মধ্য ভিয়েতনামে যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, আমি নিজে সেখানে ছিলাম না। তবুও ঘটনাটি আজও আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে খবর দেখতাম এবং আবহাওয়া ও বন্যার পরিস্থিতির আপডেট অনুসরণ করতাম।

আমার মনে আছে, একের পর এক ঝড় এবং কয়েক দিনের টানা ভারী বৃষ্টির পর কোয়াং বিন, কোয়াং ত্রি, থুয়া থিয়েন হয়ে এবং কোয়াং নাম ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। খুব দ্রুত পানির উচ্চতা বেড়ে গিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়ে।

টেলিভিশনের ছবিগুলো ছিল হৃদয়বিদারক। মানুষকে বাড়ির ছাদে বসে উদ্ধারের অপেক্ষা করতে দেখেছিলাম। অনেক শিশু তাদের স্কুলের বই হারিয়েছিল। পরিচিত রাস্তাগুলো পরিণত হয়েছিল নদীতে।

আমি তখন খুব ছোট হলেও ভীষণ দুঃখ আর উদ্বেগ অনুভব করেছিলাম। সেটিই ছিল প্রথমবার, যখন বুঝেছিলাম—একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে মানুষের পুরো জীবন বদলে দিতে পারে।

২. আমার গল্প

এখন আমি বড় হয়েছি। তথ্যচিত্র, সংবাদ প্রতিবেদন এবং স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতার গল্পের মাধ্যমে সেই বন্যা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জেনেছি। এখন পেছনে ফিরে তাকালে বুঝতে পারি, প্লাবিত এলাকার পরিবারগুলোর জন্য সেই সময়টা কতটা কঠিন ছিল।

অনেক বাড়ি পুরোপুরি পানির নিচে চলে গিয়েছিল। আসবাবপত্র, কাপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কিংবা পানিতে ভেসে গিয়েছিল। কিছু পরিবারকে স্কুল বা কমিউনিটি সেন্টারে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, কারণ নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না।

অনেক দিন শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে পারেনি। শ্রেণিকক্ষগুলো পানিতে ডুবে গিয়েছিল, বই, ডেস্ক এবং পড়াশোনার বিভিন্ন সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানি এবং মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফলে দৈনন্দিন জীবন আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল।

তবে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছিল, তা হলো পুরো ভিয়েতনামজুড়ে মানুষের একতার অসাধারণ চিত্র।

বন্যা শুরু হওয়ার পরপরই সরকার বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জরুরি উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দেয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সৈনিক, পুলিশ, চিকিৎসাকর্মী এবং উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়। তাদের কাজ ছিল মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, নিখোঁজদের খুঁজে বের করা এবং খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধ পৌঁছে দেওয়া।

সৈনিক ও পুলিশ সদস্যদের গভীর পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে, নৌকা চালাতে, বয়স্ক মানুষকে পিঠে করে নিয়ে যেতে এবং ছোট শিশুদের কোলে তুলে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে দেখার দৃশ্যগুলো আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল।

তাদের কেউ কেউ ঘন্টার পর ঘন্টা পানির মধ্যে থেকে একে একে মানুষকে উদ্ধার করেছেন। যেসব গ্রাম পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, সেখানে খাবার ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রী পৌঁছে দিতে উদ্ধারকারী ট্রাক ও হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা হয়েছিল।

সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলোর একটি ছিল ২০২০ সালের ১৮ অক্টোবর কোয়াং ত্রির Economic and Defence Unit ৩৩৭-এ ঘটে যাওয়া ভূমিধস। স্থানীয় মানুষদের উদ্ধারে কাজ করার সময় সেই ভূমিধসে ২২ জন কর্মকর্তা ও সৈনিক প্রাণ হারান।

এর আগে কোয়াং নামের ট্রা লেং-এ আরেকটি ভূমিধসের পরও উদ্ধারকারী দল বিপজ্জনক আবহাওয়ার মধ্যে নিরলসভাবে নিখোঁজদের সন্ধান চালিয়ে গিয়েছিল।

তাদের আত্মত্যাগ আমাকে সেই মানুষগুলোর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দিয়েছে, যারা অন্যদের রক্ষা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত ঝুঁকিতে ফেলতে প্রস্তুত থাকেন।

আমার নিজ শহর কোয়াং নিনেও অনেক মানুষ মধ্য ভিয়েতনামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য অর্থ, কাপড় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দান করেছিলেন। আমার পরিবারও সেই উদ্যোগে অংশ নিয়েছিল।

আমার এখনো মনে আছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে মিলে কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস স্থানীয় একটি সংগ্রহকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছিলাম।

আমরা যদিও বন্যাকবলিত এলাকা থেকে অনেক দূরে থাকতাম, তবু সবাই কিছু না কিছু করে সাহায্য করতে চেয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা আমাকে দয়া ও ভাগ করে নেওয়ার প্রকৃত অর্থ শিখিয়েছিল।

বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরও আমি খবর অনুসরণ করতে থাকি। অনেক স্বেচ্ছাসেবী দল মধ্য ভিয়েতনামে গিয়ে বাড়িঘর থেকে কাদা পরিষ্কার করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত ঘর মেরামত করেছে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে আবার স্কুলে ফিরতে পারে, সেজন্য স্কুলগুলো প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে।

ধীরে ধীরে জীবন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল। কিন্তু প্রিয়জন হারানোর যে শূন্যতা, কিংবা সম্পদ হারানোর যে ক্ষত-তা অনেক মানুষ কোনোদিনই ভুলতে পারবে না।

৩. শিক্ষা ও আশা

এই দুর্যোগ আমাকে শিখিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু বাড়িঘর বা সম্পত্তি ধ্বংস করে না; বহু পরিবারের মনে গভীর মানসিক ক্ষতও রেখে যায়।

আমি আরও শিখেছি, দুর্যোগ আসার পর প্রতিক্রিয়া দেখানোর চেয়ে দুর্যোগের আগেই প্রস্তুত হওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কোয়াং নিনে বসবাসকারী একজন শিক্ষার্থী হিসেবে, যেখানে প্রায়ই শক্তিশালী ঝড় হয়, আমার মনে হয় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং একটি জরুরি ব্যাগ প্রস্তুত রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সেই ব্যাগে পানীয় জল, শুকনো খাবার, ওষুধ, টর্চ, অতিরিক্ত ব্যাটারি, পাওয়ার ব্যাংক এবং জলরোধী ব্যাগে রাখা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র থাকা উচিত।

এছাড়াও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দিতে পারার জন্য নিজের এলাকার নিরাপদ আশ্রয় বা সরিয়ে নেওয়ার স্থানগুলো সম্পর্কে জানা দরকার।

আমার মনে হয়, সরকারকে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আরও উন্নত করা, বন্যা প্রতিরোধের অবকাঠামো শক্তিশালী করা এবং আরও বেশি জরুরি মহড়ার আয়োজন করা চালিয়ে যেতে হবে, যাতে দুর্যোগের সময় মানুষ কী করবে তা আগে থেকেই জানে।

স্কুলগুলোরও দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে আরও কার্যক্রম চালু করা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের এবং অন্যদের নিরাপদ রাখার বাস্তব দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

সবশেষে, আমি আশা করি তরুণরা কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিকে উপেক্ষা করবে না এবং যখনই সম্ভব অন্যদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

জিনিসপত্র দান করা, স্বেচ্ছাসেবী কাজে অংশ নেওয়া কিংবা পরিবেশ রক্ষা করার মতো ছোট ছোট কাজও বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

আমরা সবাই যদি একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে ভবিষ্যতের জন্য আরও শক্তিশালী ও নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতে পারব।

(দশম শ্রেণি; ইয়েন হুং প্রাইমারি, সেকেভারি অ্যান্ড হাই স্কুল, কোয়াং ইয়েন)

বিদ্যুৎহীন রাতগুলো

নগক আন

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর-এমন একটি সময়, যা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

কোয়াং নিন প্রদেশের একটি ছোট গ্রামীণ গ্রামে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। টাইফুন ইয়াগি আঘাত হানার আগে পুরো গ্রামটাই যেন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। আমাদের কমিউনের মাইকে বারবার ঝড়ের সর্বশেষ খবর জানানো হচ্ছিল এবং সবাইকে নিজেদের বাড়িঘর নিরাপদ করতে, গাছের ডালপালা ছাঁটাই করতে এবং পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় জল মজুত রাখতে বলা হচ্ছিল। আমার বাবা ছাদে উঠে ঝড়ের প্রবল বাতাসে উড়ে যেতে পারে এমন টিনের পাতগুলো শক্ত করে বেঁধে দিচ্ছিলেন। মা চাল, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, বোতলজাত পানি, মোমবাতি আর একটি পাওয়ার ব্যাংক কিনে রেখেছিলেন। সবাই ধারণা করছিল, কয়েক দিনের জন্য বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে। আমাদের বাড়ির পেছনে কয়েকটি মুরগি আর শূকর পালন করি। ঝড় আসার আগের বিকেলে বাবা-মা মুরগিগুলোকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিলেন এবং শূকরের ঘরের দরজাটাও ভালোভাবে বেঁধে দিলেন। সাধারণত আমাদের বাগান মুরগির মাটি খোঁচানোর শব্দ আর খাবারের সন্ধানে নেমে আসা চড়ুইয়ের কলকাকলিতে ভরা থাকে। কিন্তু সেদিন সবকিছুই কেমন অস্বাভাবিক লাগছিল। পাখিগুলো অস্বাভাবিক নিচু দিয়ে উড়ছিল, তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। সারি সারি পিঁপড়ে দেয়াল বেয়ে উঁচু জায়গার দিকে উঠে যাচ্ছিল। ফড়িংগুলোও মাটির একেবারে কাছ দিয়ে উড়ছিল। আকাশ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক আগেই অন্ধকার হয়ে এল। সবকিছু দেখে আমার একই সঙ্গে কৌতূহল আর ভয় হচ্ছিল। বিকেল গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের বাড়ির সামনে সারি সারি গাছ প্রচণ্ডভাবে একদিকে বেঁকে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে বাতাস শিসের মতো শব্দ করে ঢুকছিল, আর মাথার ওপর টিনের ছাদ প্রচণ্ড শব্দে কাঁপছিল। এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল যে সামনের বাগানের ওপারটাও ঠিকমতো দেখা যাচ্ছিল না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। মোমবাতি আর টর্চের ক্ষীণ আলো ছাড়া পুরো বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেল। আমি বাবা-মায়ের একেবারে কাছে বসে ছিলাম। বাতাসের শব্দ, প্রবল বৃষ্টি আর বাইরে একের পর এক জিনিস ভেঙে পড়ার শব্দে ঘুমোতেই পারছিলাম না। বারবার মনে হচ্ছিল, সকাল হলে আমাদের ছাদটা আদৌ থাকবে তো? পরদিন সকালে দরজা খুলে বাইরে তাকিয়ে আমি আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটাকে যেন চিনতেই পারছিলাম না। বড় বড় গাছ শিকড়সহ উপড়ে পড়ে ছিল। রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছিল ডালপালা আর পাতার স্তুপ। আমাদের সামনের বারান্দার ছাদের একাংশও ছিঁড়ে উড়ে গিয়েছিল। বাগান ভরে ছিল পাতা আর বৃষ্টির পানিতে। ভাগ্যক্রমে আমাদের শূকর আর মুরগিগুলো নিরাপদে ছিল। তবে তারাও খোঁয়াড়ে অস্বাভাবিক চুপচাপ হয়ে ছিল, যেন তারাও ঝড়ে ভয় পেয়েছিল। তবে ঝড়ের পরের অদ্ভুত নীরবতাটাই আমার সবচেয়ে বেশি মনে আছে। সকালে সাধারণত যে পাখির ডাক শোনা যায়, সেদিন তা ছিল না। মাঝে মাঝে শুধু কোনো কুকুরের ঘেউ ঘেউ কিংবা কাছাকাছি কোথাও মোরগের দুর্বল ডাক শোনা যাচ্ছিল।

কয়েক দিন পর যখন বন্যার পানি কমতে শুরু করল, আমাদের বাগানে হঠাৎ অনেক বেশি ব্যাঙ, কুনোব্যাঙ আর বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় দেখতে পেলাম। ছোট ছোট সাপও ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে আসছিল, কারণ তাদের লুকিয়ে থাকার জায়গাগুলো পানিতে ডুবে গিয়েছিল।

পরীক্ষার করার সময় সবাইকে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হতো, যাতে ভুল করে কোনো সাপের ওপর পা না পড়ে কিংবা কেউ কামড় না খায়। ঝড়ের পরের দিনগুলো মোটেও সহজ ছিল না।

তখনো বিদ্যুৎ ফেরেনি। পরীক্ষার পানিও খুব হিসাব করে ব্যবহার করতে হচ্ছিল। শিক্ষকরা স্কুলের ভবন পরীক্ষা করে দেখছিলেন এবং স্কুল চত্বর থেকে ভেঙে পড়া গাছ সরানোর কাজ চলছিল, তাই স্কুল কয়েক দিন বন্ধ ছিল। বাড়িতে আমি বাবা-মাকে বাগান পরীক্ষার করতে, ভাঙা ডালপালা সরাতে এবং বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করতে সাহায্য করতাম।

আমাদের প্রতিবেশীরাও একসঙ্গে কাজ করছিলেন। কেউ ছাদ মেরামত করছিলেন, কেউ পড়ে যাওয়া গাছ কেটে সরাইলেন, কেউ রাস্তা পরীক্ষার করছিলেন।

কাউকে আলাদা করে সাহায্যের জন্য ডাকতে হয়নি। সবাই বুঝতে পারছিল, পুরো গ্রাম একসঙ্গে না দাঁড়ালে এই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

আমি এখনো মনে করতে পারি, সৈনিক, পুলিশ সদস্য এবং উদ্ধারকর্মীদের ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে দেখেছি।

তারা করাত দিয়ে রাস্তা আটকে থাকা বিশাল গাছ কেটে সরিয়ে দিচ্ছিলেন, পরিবারগুলোর বাড়ি মেরামত করতে সাহায্য করছিলেন এবং যাদের বাড়ি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের কাছে খাবার ও অন্যান্য জরুরি জিনিস পৌঁছে দিচ্ছিলেন।

তাদের পোশাক বৃষ্টিতে ভিজে ছিল, কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। তবুও কাউকে অভিযোগ করতে বা দীর্ঘ সময়ের জন্য কাজ থামাতে দেখিনি।

তাদের কাজ দেখে আমার মনে গভীর কৃতজ্ঞতা জন্মেছিল। কঠিন সময়ে যারা সবসময় অন্যদের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রতি এক ধরনের গভীর শ্রদ্ধাও অনুভব করেছিলাম।

প্রায় এক সপ্তাহ পর বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ফিরে এল। স্কুলও আবার খুলল।

জীবন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করল। কিন্তু ঝড়ের চিহ্ন তখনো চারপাশে ছড়িয়ে ছিল।

উপড়ে পড়া গাছ, মেরামতের অপেক্ষায় থাকা ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি আর এলোমেলো বাগান আমাকে বারবার সেই উদ্বেগভরা দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দিত।

টাইফুন ইয়াগির অভিজ্ঞতার পর আমি বুঝতে পেরেছি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কত দ্রুত এসে পড়তে পারে এবং শুধু মানুষ নয়, আমাদের চারপাশে থাকা প্রাণীদের জীবনও কতটা বদলে দিতে পারে।

আমি শিখেছি, প্রস্তুত থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সবসময় আবহাওয়ার পূর্বাভাসের দিকে নজর রাখা উচিত, খাবার, পানীয় জল, টর্চ, অতিরিক্ত ব্যাটারি ও জরুরি সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা উচিত এবং ঝড় আসার আগেই আমাদের পশুপাখিগুলো নিরাপদে আছে কি না, তা নিশ্চিত করা উচিত।

ভবিষ্যতে যদি টাইফুন ইয়াগির মতো আরেকটি ঝড় আসে, আমি আরও শান্ত থাকার চেষ্টা করব, বাবা-মাকে প্রস্তুতির কাজে আরও আগে সাহায্য করব এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলব।

আমি এটাও আশা করি, স্কুলগুলোতে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে আরও বেশি পাঠ ও কার্যক্রম থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের পাশাপাশি অন্যদেরও কীভাবে নিরাপদ রাখতে হয়, তা শিখতে পারে।

ঝড় অনেক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, অসংখ্য গাছ উপড়ে দিয়েছিল এবং বহু পরিবারের জীবন বদলে দিয়েছিল।

তবু এখন পেছনে ফিরে তাকালে, আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে ধ্বংসের দৃশ্যগুলো নয়।

মনে পড়ে মোমবাতির আলোয় একসঙ্গে বসে থাকা আমার পরিবারকে। মনে পড়ে ক্ষয়ক্ষতি পরিষ্কার করতে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো প্রতিবেশীদের। আর মনে পড়ে নীরবে মানুষের জীবন আবার গড়ে তুলতে কাজ করে যাওয়া সেই সৈনিকদের।

সেই স্মৃতিগুলো আমাকে শিখিয়েছে—প্রাকৃতিক দুর্যোগ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, মানুষের দয়া, একতা আর আশার কাছে তাকে শেষ পর্যন্ত মোকাবিলা করা সম্ভব।

(দশম শ্রেণি; ইয়েন হুং প্রাইমারি, সেকেন্ডারি অ্যান্ড হাই স্কুল, কোয়াং ইয়েন)